Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 304 – 308
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা' : নারী জীবনের বৈচিত্র্যময়তা

পূজা বর্মন
এম. ফিল, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : pujabarman482@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
বাঁধনহারা, পত্রোপন্যাস, চিঠি, নারী।

Abstract
ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে মুসলিস সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী, পুরুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। পর্দানসীন মুসলিম সমাজের মেয়েরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মহিমায় মহিমান্বিত। এমনকি হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্ম নারীর চিত্রও চিত্রিত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি সতেরোটি পত্রের সমন্বয়ে সজ্জিত পত্রোপন্যাস। উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী নারী চরিত্র এবং পত্রোপন্যাস বলবার কারণ বিষয়টিই উদ্ভাসিত হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

Discussion
বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরবার ঘন্টা বাজে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-কে কেন্দ্র করেই। 'বিদ্রোহী' (অগ্নি-বীণা, ১৯২২) কবিতার ধ্বজা নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি নিজেই জানতেন না যে, তিনি একটা নতুন যুগের আবহ নিম্নেই হাজির হয়েছেন। তাঁর সমস্ত রচনাতেই সামাজিক, রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে ঠিকই কিন্তু কোনও সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। কবিতা ও সংগীত রচনাতেও যেমন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উপন্যাসেও। সমকালীন বিষয়বৈচিত্র্যকে হাতিয়ার করে সাহিত্য নানাভাবে তার দাবী তুলে ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী একটি বিভীষিকাময় সংকটকাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আতঙ্কগ্রস্ত পরিণতি, অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি, হতাশা ধূমায়িত হতে থাকে। অন্যদিকে রুশ বিপ্লবের হাতছানি, মানুষের নানা মানসিক ব্যাধি সংঘটিত হতে থাকে। ফ্রয়েডের অবচেতন মনের আবির্ভাবে তার নিরসন ঘটে। ক্রমান্বয়ে 'রাওলাট আইন' (১৯১৯), 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড' (১৯১৯), 'অসহযোগ আন্দোলন' (১৯২০), আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি ধর্মঘট সহ বিভিন্ন বয়কট আন্দোলন চলতে থাকে। গড়ে উঠতে থাকে নানান বিপ্লবী দল, সমিতি এবং তাদের কর্মসূচীও।

কাজী নজরুল ইসলামের বাল্যজীবন এই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মে জন্মগ্রহন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাশিয়ার অত্যাচারী শাসক ও জারের শাসন থেকে মুক্তি পেতে শ্রমিক শ্রেণি আন্দোলনে অংশগ্রহন করতে থাকে। তিনি করাচির সৈন্যদলে থাকাকালীনই এই সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের নিয়মিত খবর রাখতেন। বিশ শতকের গোড়াকার এইরকম আবহ মুহূর্তেই তাঁর আবির্ভাব।

কাব্য – কবিতা - সংগীতে নজরুল ছিলেন খুবই আবেগপ্রবণ এবং রোমান্টিক। পদ্যবন্ধের মত গদ্যবন্ধেও তাঁর প্রকাশ সবেগ ও আবেগে অস্থির। বাংলা সাহিত্যাকাশে সহসা ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে একের পর এক কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করে পাঠক হৃদয়ে ছুঁয়েছেন। সফল হওয়ার সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও তিনি তিনটির বেশি উপন্যাস রচনা করেননি। সৃজনশীল যাপন মুহূর্তের বাইশ বছর ধরে তিনি নানা সৃষ্টিশীল কাজ-কর্মে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু ত্রয়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি আট-দশ বছর সাধনার ব্রতী ছিলেন। জীবন অভিজ্ঞতার যে অংশকে তিনি কাব্য বা সংগীতে রূপদান করতে পারেননি, সেই অপ্রকাশিত জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হল তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস। একে একে প্রকাশিত হল, 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০), এবং 'কুহেলিকা' (১৯৩৮)। আমাদের আলোচনর মূল বিষয় হল, এই উপন্যাস পত্রোপন্যাস কেন এবং উপন্যাসে নারী কেমন ভাবে এসেছে। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে সংক্ষেপে উপন্যাসগুলির সারবস্তু আলোচনা করা হল —

করাচির সেনা নিবাসে থাকবার সময়ে 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭) উপন্যাসটি রচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকৃত পত্রোপন্যাস এটি। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাসটি এবং ১৯২৭ সালে এটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ পায়। মোট সতেরোটি পত্র ও ন'টি চরিত্র উপন্যাসে আছে। 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাসের পূর্বে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বসন্ত কুমারের পত্র' (১৮৮২) ও অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'পুরানো কাগজ' (১৮১৯) এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'ক্রৌঞ্চমিথুন', বনফুল 'কষ্টিপাথর' নামে পত্রোপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এগুলিকে কাহিনি বিচারে পত্রোপন্যাস বলা যায় না। যে সমস্ত উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি হয় পত্রের দ্বারা, সেগুলিই হল পত্রোপন্যাস। সেদিক থেকে দেখতে হলে 'বাঁধন হারা'-ই প্রথম সারর্থক পত্রোপন্যাস।

সার্থক পত্র উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

১. উপন্যাসের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বর্ণিত সময় ও ভবিষ্যৎ জানবার জন্য নায়ক-নায়িকার মধ্যে একটি আবেগ কাজ করে। সেই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি পত্রের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ পায়।

২. ঔপন্যাসিক ব্যক্তির ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে একটি রসঘন দূরত্ব তৈরি করেণ।

৩. পত্রোপন্যাসে পাঠকচিত্তের উদগ্র কৌতূহল উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করে রাখে। তাই এক পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে অন্য পক্ষ কী ভাবছে সেই কল্পকীয় সে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখে।

৪. বিশ্লেষণী বক্তব্য ও ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়।

৫. রচনাশৈলীর চরম উৎকর্ষকে ভালোভাবে দেখানো যায়।

৬. জীবনের অতি মৌলিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন যা অনেকটা পেঁয়াজের শল্কমোচনের সঙ্গে তুলনীয়।

৭. দুটি পত্রের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতি পাঠককে অনেক বেশি উৎসাহিত ও আনন্দদান করেন।

৮. ইলিউশন অফ রিয়েলিটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। মায়া সৃষ্টিতে এটি খুবই কার্যকরী।

তা সত্ত্বেও পত্রোপন্যাসের কিছু ত্রুটি আছে। কথকের পাঠে কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার হলেও উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকার কারণে এগুলিকে ঠিক পত্রোপন্যাস বলা যায় না। সাধারণ ভাবে প্রত্যক্ষ বর্ণনাধর্মী, আত্মকথনধর্মী আর তথ্যাশ্রয়ী

প্রামাণিকতাধর্মী- এই তিন ভাবে উপন্যাস লেখা হয়। কোনও উপন্যাসে শুধুমাত্র পত্রের দ্বারা সমগ্র উপন্যাসটি নির্মিত হয়। আবার কোনও কোনও উপন্যাসে উক্ত তিন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটে। হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যপ্রকরণ' গ্রন্থে পত্রোপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> "পত্রোপন্যাস বা এপিস্টোলারি নভেলসকে বিশেষ ধরনের উপন্যাস না বলে বিশেষ উপস্থাপন-রীতির উপন্যাস বলাই ভালো।"[১]

উপন্যাসের প্রথম চিঠি নূরুল লিখেছিলেন রবিয়লকে (২০ জানুয়ারি, সন্ধ্যা) করাচি সেনানিবাসে। বিশেষ কোনো জটিলতা নেই এখানে। মনের রাগ, অভিমান, অনুরাগের কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। 'বাঁধন-হারা' অর্থাৎ কোনও বন্ধনেই যিনি সীমাবদ্ধ নন। নূরুলও এখানে কোনও বেদনাকেই শেষ বলে মনে করেননি। রবিয়লকে লেখা চিঠিতে তাই তিনি বলেছেন,

> "আচ্ছা ভাই, যে সুক্তি আর কিছু চায়না, কেবল ছোট্ট একটি মুক্তা হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে রেখে অতল সমুদ্রের তলে নিজেকে তলিয়ে দিতে চায়।"[২]

চিঠিটি কোনও গোপন প্রেমের ইঙ্গিত বহন করে। নজরুল বাগদত্তাকে ছেড়ে করাচির সেনানিবাসে চলে যান। সংসারের কোনও বন্ধনই তাঁকে 'বাঁধন-হারা' করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পত্রটি করাচির সোনানিবাস থেকে (২১ জানুয়ারি প্রভাত) মনূয়রকে লেখা হয়। এই পত্রের মাধ্যমে নূরুল ফেলে আসা সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। করাচিতে যাওয়ার আগে নূরুলের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু নূরুল সবাইকে ভালোবাসতে চায়। সে কোনও এক নারীতে আসক্ত থাকতে চায় না। নূরুলের ভালোবাসাকে বুঝতে পেরেছিল সাহসিকা। সে নূরুলকে ভাই বলে সম্বোধন করে। নূরুলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে রাবেয়ার ছোট ভাই মনূয়র। রাবেয়ার ননদ সোফিয়ার বান্ধবী মাহবুবার সাথে নূরুলের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু নূরুল বিয়ের দিন পালিয়ে চলে যায় করাচির সৈন্যদলে। ইতিমধ্যে সে উপলব্ধিও করতে পারে যে, সোফিয়াও তাকে খুব ভালবাসে। বীরভূমের এক মস্ত জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও মাহবুবা সুখী হয়না। তাঁর স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন, অন্যদিকে সোফিয়াও দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগেন। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম,

> "হেয়ারি শ্যামল ঘন নীল গগনে/ সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।।"[৩]

তৃতীয় পত্রটি রবিয়ল, নূরুল হুদার পাঠানো পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন (২৯ জানুয়ারি, মুর্শিদাবাদ)। এই পত্রে রবিয়ল একটি তত্ত্বের উল্লেখ করে ব্যস্ত জীবনের কথাই তুলে ধরেছেন।

> "মানুষ যতদিন বিয়ে না করে, ততদিন তার থাকে দুটি পা। সে তখন স্বচ্ছন্দে যে কোন দ্বিপদ প্রাণীর মতো স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতেও পারে। কিন্তু যেই সে বিয়ে করল, অমনি হয়ে গেল তার দু-জোড়া বা এক গণ্ডা পা।"[৪]

সোফিয়া নূরুলকে ভালোবেসেছিল। তাই নূরুল যেদিন করাচিতে চলে যায়, সেদিন থেকেই তার মন খারাপ। প্রায় এক সপ্তাহ সে অভুক্ত ছিল। রবিয়ল নূরুলকে বলেছে,

> "তুই চলে যাবার পর ওর যদি কান্না দেখতিস, সাতদিন সাত রাত না-খেয়ে না-দেয়ে সে শুধু কেঁদেছিল।"[৫]

চতুর্থ পত্রটি অভিমানিনী নূরুলের মা তাঁর পুত্রকে লিখেছেন। যদিও তিনি নিজের মা নন, তবুও তাঁকে পুত্র স্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন। অনেকদিন মায়ের কোনও খবরও রাখে না নূরুল, তাই অভিমানিনী মায়ের এই পত্র।

পঞ্চম পত্রটি মনূয়র, নূরুলকে লিখেছেন (বাঁকুড়া থেকে)। করাচির সাগর সৈকত তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা এখানে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আছে। সেটি হল সোফিয়ার সঙ্গে মনূয়রের বিবাহ।

ষষ্ঠ পত্রটি লিখেছেন রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (৬ ফাল্গুন, মুর্শিদাবাদের সালার)। নূরুলের আচার ব্যবহার রাবেয়ার একদমই পছন্দ নয়। তার বিরুদ্ধে রাবেয়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রথমত, মাহবুবার সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে পর্যন্ত নূরুলের আচরণকে রাবেয়া অসামাজিক অন্যায় বলে দোষারোপ করেছেন। যদিও পরবর্তীকালে চেনা-

জানাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। রবিয়লের সমর্থনে মাহবুবা ও নূরুলের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহের ঠিক পূর্বে করাচিতে চলে যাওয়ার কারণে নূরুলের প্রতি তীব্র ঘৃণা করতে থাকেন রাবেয়া। অন্যদিকে মাহবুবার বাবা মারা যাওয়ার পর তার মায়ের হাত ধরে সে মামাবাড়িতে চলে যায়। রাবেয়ার চোখে মাহবুবার কোনও দোষ নেই।

"এই যে মাহবুবার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, এতে আমরা বলব, তার হায়াত ছিল না।"[৬]

মামার বাড়িতে মাহবুবার অবস্থানটি খুব ভালোভাবেই জানা যায় সপ্তম চিঠি দেখে। নবম পত্রটি ভাবী সাহেবা রাবেয়াকে লিখেছেন নূরুল। নূরুলের উপর যে সমস্ত অভিযোগ আছে তা স্বীকার করে না নূরুল। বরং সে বলে মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই তার আনন্দ। নূরুলের এরূপ শয়তানি মানুষের উপর নয়, মানুষের স্রষ্টার উপর। এই সৃষ্টিকর্তাকে নূরুল কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না। দশম চিঠিতে মনূয়র, নূরুলকে অভিযোগ করেছে। একাদশ পত্রে করাচির সেনানিবাসের একটি সুন্দর বর্ণনা করে মনূয়রকে লিখেছেন নূরুল। মাহবুবাকে লেখা রাবেয়ার প্রথম পত্র আমরা দ্বাদশ নং পত্রে পাই। এটি অনেক স্মৃতিমূলক পত্র যেখানে মাহবুবার বীরভূমের মামা বাড়িতে চলে যাওয়া ও সেখানে তাদের করুন অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে।

শোফিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছে মনূয়রের সঙ্গে (ত্রয়োদশ পত্র)। এই খবরটি মাহবুবার মা আয়েশাকে জানানো হয়েছে ও বিয়েতে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চিঠির উত্তরে রাবেয়াকে জানানো হয়েছে যে, তারা সালারে যেতে পারবে না। নূরুলের এই অপমান কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবেও না।

"নুরুলকে আমি বদ দোওয়া করবো না।"[৭]

আয়েশা বিবি মাহবুবার বিয়ের কারণে সোফিয়ার বিয়েতে আসতে পারবে না।

পঞ্চদশ চিঠি রাবেয়া, শিক্ষিকা সাহসিকাকে লিখেছিলেন। অবিবাহিত সাহসিকাই একসময় 'পাগল ভাই আমার', 'পথিক ভাই আমার' বলে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সোফিয়া-মনূয়রের বিয়েতে সাহসিকা ও নূরুলের আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

শিক্ষিকা সাহসিকা'র রাবেয়াকে (ষোড়শ পত্র) পাঠানো চিঠির মাধ্যমে এক বিদূষী, স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এক ব্রাহ্ম পরিচালিত স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাহসীকার ধর্ম সম্পর্কে মতামত —

"মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়া নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সারসত্য এগুলো তো বাইরের বিধি।"[৮]

উপন্যাসের সর্বশেষ চিঠি নুরুল, সাহসিকাকে পাঠায়। এই চিঠি পাঠ করার পরেই বোঝা যায় নূরুলকে শুধুমাত্র মাহবুবা ভালোবাসেনি সোফিয়াও ভালবেসেছিল। সালারে থাকবার সময় সোফিয়া তার ভালোবাসা বুঝতে পারেনি। নূরুল যখন করাচি যায় তখন সে তার উপলব্ধি করে। পরবর্তীকালে নূরুল যখন বুঝতে পারে তখন একটি ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা করে। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটির ঘটনাবলী বিভিন্ন পত্রের দ্বারা বিন্যস্ত হয়েছে। নূরুল হুদা'ই প্রকৃতপক্ষে বাঁধনহারা।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাহবুবা'কে কেন্দ্র করেই সোফিয়া, রাবেয়া,সাহসিকা প্রমুখ নারীচরিত্রগুলি বিবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীই পত্রের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। ফলে 'বাঁধন- হারা'কে পত্র উপন্যাস বলতে অত্যুক্তি হয় না।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাহবুবা'র জন্যই মূলত বিভিন্ন পত্রের অবতরণ হয়েছে। নায়ক নূরুল হুদা মাহবুবা'কে বিয়ে করে করবে বলে যখন সব ঠিকঠাক তখনই সে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই ক্রমান্বয়ে পত্র লেখা হয়েছে। ছোট থেকেই মাহবুবা শান্ত প্রকৃতির মেধাবী মেয়ে। বিয়ের দিন নূরুল করাচির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য। মাহবুবাও তাকে বিদায় জানায়। তার বিদায় সম্পর্কেও সাহসিকা জানায়—

"সে সহজিয়া। সে সহজেই এই ক্ষ্যাপাটাকে ভালোবেসেছিল, আর এমন সহজ হয়েই চিরজনম ভালবাসবে।"[৯]

মাহবুবা সত্যিই সহজিয়া। জীবনের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবটাই তিনি মেনে নিয়েছেন। জোর জবরদস্তি করে সে কিছুই আদায় করেনি। মামার বাড়ির অত্যাচারও নীরবে সহ্য করেছে এবং একথা বান্ধবী সোফিয়ার কাছে প্রকাশ করেছে।

সোফিয়াও নূরুলকে ভালবেসেছিল কিন্তু তা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। মাহবুবার মতো সোফিয়াও প্রতিবাদী নন। ড. সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন—

"সোফিয়ার প্রেম ছিল ভীরু কৃষ্ণকলির মতো। সে ফুটেই ঝরে যেতে চায়।"[১০]

সোফিয়া ছোট থেকেই একটু দুষ্ট প্রকৃতির। তার সাথে কলেজ পড়ুয়া মনূয়রের বিবাহ হয়। বিবাহ কথাবার্তা চলাকালীন সোফিয়ার মধ্যে তেমন উদ্দামতা পরিলক্ষিত হয়নি। সেজন্য সোফিয়ার ভাবি রাবেয়া ও রবিয়ল দুশ্চিন্তায় পড়েন।

"এই খানে আর একটি কথা... এ বিয়ের কথাবার্তা হবার পর থেকেই সোফি যেন কেমন গুম হয়ে গিয়েছে।"[১১]

রাবেয়ার এই পত্র থেকে বোঝা যায় সোফিয়ার এ বিয়েতে অমত ছিল। নূরুলের প্রতি দুর্বলতা তার প্রধান কারণ হলেও কোনদিন তা প্রকাশ্যে আনেননি।

পত্রোপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল, সাহসিকা বোস। তিনি বিদূষী, সাহসী, প্রগতিশীল ও স্বতন্ত্রময়ী একজন অবিবাহিতা নারী। তিনি বি. এ পাশ করে শিক্ষায়িত্রী হয়েছেন। চিরকুমারী স্থানীয় ব্রাহ্ম পরিচালিত স্কুলের শিক্ষিকা তিনি। ধর্ম সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে উদার হওয়ার কথা তাঁর বক্তব্যে খুঁজে পাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ঘোষের সাথে সাহসিকতা বোসের চরিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সাহসিকা বোসের জীবনও সুখের নয়। প্রথম জীবনের তিনিও প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিয়ে তাঁদের হয়নি। রাবেয়াকে লেখা একটি চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"প্রথম জীবনেই সে বুকে মস্ত এক দাগ পেয়ে বিয়ে টিয়ে করেনি, চিরকুমারী থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।"[১২]

নূরুল হুদা জীবনে নতুন উদ্যমে অধ্যায় শুরু করেন একমাত্র সাহসিকার জন্য।

কাজী নজরুলের দৃষ্টিতে 'বাঁধনহারা' উপন্যাসটিতে নারীর এক মর্যাদাময় স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলি নিজেদের অধিকার বশেই পাঠকের অন্তরে স্থিতিলাভ করেছে। আর এখানেই ঔপন্যাসিক নজরুলের কৃতিত্ব। রক্ষণশীল, পর্দানশীন মুসলমান মহিলাকে ব্যক্তিত্বময়ী নারীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকি সাহসিকা বোসের মত হিন্দু নারীর প্রগতিশীল তথা মর্যাদাসম্পন্ন চরিত্রাঙ্কনেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। নজরুলের পূর্ববর্তী কোনো কথাকার এমনভাবে জাতপাতের উর্ধ্বে গিয়ে হিন্দু নারীকে দেখাতে পারেননি এবং প্রচেষ্টাও করেননি। আর এখানে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বোৎকৃষ্ট।

Reference :

১. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশার্স, পৃ. ৭৮

২. মন্ডল, গৌতম, গদ্য রচনাকার কাজী নজরুল ইসলাম, ২০১৮, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, তত্বাবধায়ক সুবোধ কুমার যশ, পৃ. ৬

৩. তদেব, পৃ, ৭

৪. তদেব, পৃ, ২৪

৫. তদেব, পৃ, ৫৭ - ৫৯

৬. তদেব, পৃ. ৭৪ - ৭৭

৭. সান্যাল, ড: অরুণ (সম্পা), প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ, ৩৭১

৮. তদেব, পৃ. ৩৭৩ - ৩৭৫

৯. তদেব, পৃ. ৩৭৭

১০. তদেব, পৃ. ৩৮৪ - ৩৮৬

১১. কাজী সব্যসাচী, কাজী কল্যাণী, দে বিশ্বনাথ (সম্পা), নজরুল উপন্যাস সমগ্র, ১৩৮৪, পৃ. ২

১২. তদেব, পৃ. ৫